শৈল রহস্য

সহ্যাদ্রি হোটেল
মহাবলেশ্বর—পুণা
৩রা জানুআরি

ভাই অজিত,

বোম্বাই এসে অবধি তোমাদের চিঠি দিতে পারিনি। আমার পক্ষে চিঠি লেখা কি রকম কষ্টকর কাজ তা তোমরা জানো। বাঙালীর ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর। কিন্তু আমি বিয়ের পর দু'দিনের জন্যেও বৌ ছেড়ে রইলাম না, চিঠি লিখতে শিখব কোত্থেকে ? তুমি সাহিত্যিক মানুষ, বিয়ে না করেও লম্বা চিঠি লিখতে পার। কিন্তু তোমার কল্পনাশক্তি আমি কোথায় পাব ভাই। কাঠখোট্টা মানুষ, স্রেফ সত্য নিয়ে কারবার করি।

তবু আজ তোমাকে এই লম্বা চিঠি লিখতে বসেছি। কেন লিখতে বসেছি তা চিঠি শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে। মহাবলেশ্বর নামক শৈলপুরীর সহ্যাদ্রি হোটেলে রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বেলে এই চিঠি লিখছি। বাইরে শীতজর্জর অন্ধকার ; আমি ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করে লিখছি, তবু শীত আর অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোমবাতির শিখাটি থেকে থেকে নড়ে উঠছে ; দেয়ালের গায়ে নিঃশব্দ ছায়া পা টিপে টিপে আনাগোনা করছে। ভৌতিক পরিবেশ। আমি অতিপ্রাকৃতকে সারা জীবন দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি, কিন্তু—

অনেক দিন আগে একবার মুঙ্গেরে গিয়ে বরদাবাবু নামক একটি ভূতজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মনে আছে ? আমি তাঁকে বলেছিলাম—ভূত প্রেত থাকে থাক, আমি তাদের হিসেবের বাইরে রাখতে চাই। এখানে এসে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি, ওদের আর হিসেবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু থাক। গল্প বলার আর্ট জানা নেই বলেই বোধ হয় পরের কথা আগে বলে ফেললাম। এবার গোড়া থেকে শুরু করি—

যে-কাজে বোম্বাই এসেছিলাম সে কাজটা শেষ করতে দিন চারেক লাগল। ভেবেছিলাম কাজ সেরেই ফিরব, কিন্তু ফেরা হল না। কর্মসূত্রে একজন উচ্চ পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মারাঠী ভদ্রলোক, নাম বিষ্ণু বিনায়ক আপ্টে। তিনি বললেন, 'বম্বে এসেছেন, পুণা না দেখেই ফিরে যাবেন ?'

প্রশ্ন করলাম, 'পুণায় দেখবার কী আছে ?'

তিনি বললেন, 'পুণা শিবাজী মহারাজের পীঠস্থান, সেখানে দেখবার জিনিসের অভাব ? সিংহগড়, শনিবার দুর্গ, ভবানী মন্দির—'

ভাবলাম এদিকে আর কখনও আসব কি না কে জানে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। বললাম, 'বেশ, যাব।'

আপ্টের মোটরে চড়ে বেরুলাম। বোম্বাই থেকে পুণা যাবার পাকা মোটর-রাস্তা আছে, সহ্যাদ্রির গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গিয়েছে। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনা করা আমার কর্ম নয়। এক পাশে উত্তুঙ্গ শিখর, অন্য পাশে অতলস্পর্শ খাদের কোলে সবুজ উপত্যকা। তুমি যদি দেখতে, একটা চম্পূকাব্য লিখে ফেলতে।

পুণায় আপ্টের বাড়িতে উঠলাম। সাহেবী কাণ্ডকারখানা, আদর যত্নের সীমা নেই। আমাকে আপ্টে যে এত খাতির করছেন তার পিছনে আপ্টের স্বাভাবিক সহৃদয়তা তো আছেই, বোধ হয় বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ইশারাও আছে। সে যাক। পুণায় বোম্বাই-এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ; কারণ বোম্বাই শহর সমুদ্রের সমতলে, আর পুণা সমুদ্র থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে। পুণার ঠাণ্ডায় কিন্তু বেশ একটি চনমনে ভাব আছে ; শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলে, জড়ভরত করে ফেলে না।

পুণায় তিন দিন থেকে দর্শনীয় যা-কিছু আছে সব দেখলাম। তারপর আপ্টে বললেন, 'পুণায় এসে মহাবলেশ্বর না দেখে চলে যাবেন ?'

আমি বললাম, 'মহাবলেশ্বর ! সে কাকে বলে ?'

আপ্টে হেসে বললেন, 'একটা জায়গার নাম। বম্বে প্রদেশের সেরা হিল-স্টেশন। আপনাদের যেমন দার্জিলিং আমাদের তেমনি মহাবলেশ্বর। পুণা থেকে আরও দু'হাজার ফুট উঁচু। গরমের সময় বম্বের সবাই মহাবলেশ্বর যায়।'

'কিন্তু শীতকালে তো যায় না। এখন ঠাণ্ডা কেমন ?'

'একেবারে হোম ওয়েদার। চলুন চলুন, মজা পাবেন।'

অতএব মহাবলেশ্বরে এসেছি এবং বেশ মজা টের পাচ্ছি।

পুণা থেকে মহাবলেশ্বর বাহাত্তর মাইল ; মোটরে আসতে হয়। আমরা পুণা থেকে বেরুলাম দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, মহাবলেশ্বরে পৌঁছুলাম আন্দাজ চারটের সময়। পৌঁছে দেখি শহর শূন্য, দু'চারজন স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া সবাই পালিয়েছে। সত্যিই হোম ওয়েদার ; দিনের বেলায় হি হি কম্প, রাত্রে হি হি কম্প। ভাগ্যিস আপ্টে আমার জন্যে একটা মোটা ওভারকোট এনেছিলেন, নইলে শীত ভাঙতো না।

শহরের বর্ণনা দেব না, মনে কর দার্জিলিঙের ছোট ভাই। আপ্টে আমাকে নিয়ে সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠলেন। হোটেলে একটিও অতিথি নেই, কেবল হোটেলের মালিক দু'তিন জন চাকর নিয়ে বাস করছেন।

হোটেলের মালিক জাতে পার্সী, নাম সোরাব হোমজি। আপ্টের পুরনো বন্ধু। বয়স্ক লোক, মোটাসোটা, টকটকে রঙ। বিষয়বুদ্ধি নিশ্চয় আছে, নইলে হোটেল চালানো যায় না ; কিন্তু ভারি অমায়িক প্রকৃতি। আপ্টে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে খুব সমাদর করে নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। অবিলম্বে কফি এসে পড়ল, তার সঙ্গে নানারকম প্যাস্ট্রি। ভাল কথা, তুমি বোধ হয় জান না, গোঁড়া পার্সীরা ধূমপান করে না, কিন্তু মদ খায়। মদ না খেলে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে।

কফি-পর্ব শেষ না হতে হতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। অতঃপর আপ্টে আমাকে হোটেলে রেখে মোটর নিয়ে বেরুলেন ; এখানে তাঁর কে একজন আত্মীয় আছে তার সঙ্গে দেখা করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন। তিনি চলে যাবার পর হোমজি মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বাঙালী। শুনে আশ্চর্য হবেন, মাস দেড়েক আগে পর্যন্ত এই হোটেলের মালিক ছিলেন

একজন বাঙালী।'

আশ্চর্য হলাম। বললাম, 'বলেন কি ! বাঙালী এতদূরে এসে হোটেল খুলে বসেছিল !'

হোমজি বললেন, 'হ্যাঁ। তবে একলা নয়। তাঁর একজন গুজরাতী অংশীদার ছিল।'

এই সময় একটা চাকর এসে অবোধ্য ভাষায় তাঁকে কি বলল, তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি স্নান করবেন ? যদি করেন, গরম জল তৈরি আছে।'

বললাম, 'রক্ষে করুন, এই শীতে স্নান ! একেবারে বোম্বাই গিয়ে স্নান করব।'

চাকর চলে গেল। তখন আমি হোমজিকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি তো বম্বের লোক ? তাহলে এই শীতে এখানে রয়েছেন কেন ? এখানে তো কাজকর্ম এখন কিছু নেই।'

হোমজি বললেন, 'কাজকর্ম আছে বৈকি। মার্চ মাস থেকে হোটেল খুলবে, অতিথিরা আসতে শুরু করবে। তার আগেই বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্‌ফাট করে তুলতে হবে। তাছাড়া বাড়ির পিছন দিকে গোলাপের বাগান করেছি। চলুন না দেখবেন। এখনও দিনের আলো আছে।'

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে বাগান দেখলাম। বাগান এখনও তৈরি হয়নি, তবে মাসখানেকের মধ্যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করবে। হোমজির ভারি বাগানের শখ।

এইখানে সহ্যাদ্রি হোটেলের একটা বর্ণনা দিয়ে রাখি। চুনকাম করা পাথরের দোতলা বাড়ি, সবসুদ্ধ বারো-চৌদ্দটা বড় বড় ঘর আছে। সামনে দিয়ে গেরুমাটি ঢাকা রাস্তা গিয়েছে ; পিছন দিকে গোলাপ বাগানের জমি, লম্বায় চওড়ায় কাঠা চারেক হবে। তারপরই গভীর খাদ ; শুধু গভীর নয়, খাড়া নেমে গিয়েছে। পাথরের মোটা আলসের উপর ঝুঁকে উঁকি মারলে দেখা যায়, অনেক নিচে ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা সরু ঝরনার ধারা বয়ে গেছে।

আমরা বাগান দেখে ফিরছি এমন সময় খাদের নীচে থেকে একটা গভীর আওয়াজ উঠে এল। অনেকটা মোষের ডাকের মত। নীচে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, ওপরে একটু আলো আছে ; আমি জিগ্যেস করলাম, 'ও কিসের আওয়াজ ?'

হোমজি বললেন, 'বাঘের ডাক। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে ; চাকর একটা গন্‌গনে কয়লার আংটা মেঝের উপর রেখে গেছে। আমরা আংটার কাছে চেয়ার টেনে বসলাম। ঠাণ্ডা আঙুলগুলোকে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এদিকে বড় বাঘ আছে ?'

হোমজি বললেন, 'আছে। তাছাড়া চিতা আছে, হায়েনা আছে, নেকড়ে আছে। যে বাঘটার ডাক আজ শুনলেন সেটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে কিনা, তাই এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারছে না।'

'মানুষখেকো বাঘ ! কত মানুষ খেয়েছে ?'

'আমি একটার কথাই জানি। ভারি লোমহর্ষণ কাণ্ড ! শুনবেন ?'

এই সময় আপ্টে ফিরে এলেন, লোমহর্ষণ কাণ্ড চাপা পড়ে গেল। আপ্টে বললেন, তাঁর আত্মীয় ছাড়ছেন না, আজ রাত্রে তাঁকে সেখানেই ভোজন এবং শয়ন করতে হবে। কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে তিনি উঠলেন, আমাকে বললেন, 'কাল সকাল ন'টার মধ্যে আমি আসব। আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন, দু'জনে বেরুব। এখানে অনেক দেখবার জায়গা আছে ; বম্বে পয়েন্ট, আর্থার্স সীট, প্রতাপগড় দুর্গ—'

তিনি চলে গেলেন। আমরা আরও খানিকক্ষণ বসে এটা-সেটা গল্প করলাম। এখানে এখন শাকসব্জি-দুধ-ডিম-মুর্গী খুব সস্তা, আবার গরমের সময় দাম চড়বে।

কথায় কথায় হোমজি বললেন, 'আপনার ভূতের ভয় নেই তো ?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বলেন, 'কারুর কারুর থাকে। একলা ঘরে ঘুমোতে পারে না। তাহলে আপনার শোবার ব্যবস্থা যদি দোতলায় করি আপনার অসুবিধা হবে না ?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র না। আপনি কোথায় শোন ?'

তিনি বললেন, 'আমি নীচেয় শুই। আমার বসবার ঘরের পাশে শোবার ঘর। আপনাকে ওপরে দিচ্ছি তার কারণ, এখন সব ঘরের বিছানাপত্র তুলে গুদামে রাখা হয়েছে। অতিথি তো নেই। কেবল দোতলার একটা ঘর সাজানো আছে। তাতে হোটেলের ভূতপূর্ব মালিক সস্ত্রীক থাকতেন। ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে।'

বললাম, 'বেশ তো, সেই ঘরেই শোব।'

হোমজি চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন, চাকর চলে গেল, তারপর আটটা বাজলে আমরা খেতে বসলাম। এরি মধ্যে মনে হল যেন কত রাত হয়ে গেছে, চারদিক নিষুতি। বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে, মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। গল্প শোনার এই উপযুক্ত সময়। বললাম, 'আপনার লোমহর্ষণ কাণ্ড কৈ বললেন না ?'

হোমজি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এই বাড়িতেই ঘটেছিল আগেকার দুই মালিকের মধ্যে। বলি শুনুন।'

হোমজি বলতে আরম্ভ করলেন। খাওয়া এবং গল্প একসঙ্গে চলতে লাগল। হোমজি বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারেন, তাড়াহুড়ো নেই। তাঁর মাতৃভাষা অবশ্য গুজরাতী, কিন্তু ইংরেজিতেই বরাবর কথাবার্তা চলছিল। গল্পটাও ইংরেজিতেই বললেন। আমি তোমার জন্যে বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম।—

বছর ছয়েক আগে মানেকভাই মেহতা নামে একজন গুজরাতী আর বিজয় বিশ্বাস নামে একজন বাঙালী মহাবলেশ্বরে এই সহ্যাদ্রি হোটেল খুলেছিল। দু'জনে সমান অংশীদার ; মেহতার টাকা আর বিজয় বিশ্বাসের মেহনত। এই নিয়ে হোটেল আরম্ভ হয়।

মানেক মেহতার অনেক কাজ-কারবার, সে মহাবলেশ্বরে থাকত না ; তবে মাঝে মাঝে আসত। বিজয় বিশ্বাসই হোটেলের সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু আসলে হোটেলের দেখাশোনা করতেন বিজয় বিশ্বাসের স্ত্রী হৈমবতী। বিজয় বিশ্বাস কেবল ঘরে বসে সিগারেট টানতেন আর হিসেব-নিকেশ করতেন।

মানেক মেহতা লোকটা ছিল প্রচণ্ড পাজি। অবশ্য তখন তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, তাকে ভাল করে কেউ চোখে দেখেনি। পরে সব জানা গেল। তার তিনটে বৌ ছিল, একটা গোয়ায়, একটা বম্বেতে, আর একটা আমেদাবাদে। এই তিন জায়গায় বেশির ভাগ সময় সে থাকত। যত রকম বে-আইনী দুষ্কার্য করাই ছিল তার পেশা। বোম্বাই প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ, লোকটি বুট্‌লেগিং করত। বিদেশ থেকে লুকিয়ে সোনা আমদানি করত। অনেকবার তার মাল বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ ধরতে পারেনি।

বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানেক মেহতার জোটপাট কি করে হল বলা যায় না। বিজয় বিশ্বাস লোকটি ও রকম ছিলেন না। যতদূর জানা যায়, বিজয় বিশ্বাস আগে থেকেই হোটেল চালানোর কাজ জানতেন ; হয়তো পুণায় কিম্বা বোম্বাই-এ কিংবা আমেদাবাদে ছোটখাটো হোটেল চালাতেন। তারপর তিনি মানেক মেহতার নজরে পড়ে যান। মানেক মেহতা যে ধরনের ব্যবসা করে তাতে কখনও হাতে অঢেল পয়সা, কখনও ভাঁড়ে মা ভবানী। সে বোধ হয় মতলব করেছিল হোটেল কিনে কিছু টাকা আলাদা করে রাখবে, যাতে সঙ্কটকালে হাতে একটা রেস্ত থাকে। বিজয় বিশ্বাস তার প্রকৃত চরিত্র জানতেন না, সরল মনেই তার অংশীদার

হয়েছিলেন।

বিজয় বিশ্বাস আর তাঁর স্ত্রীর ম্যানেজমেন্টে সহ্যাদ্রি হোটেল অল্পকালের মধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে উঠল। মহাবলেশ্বরে হোটেলের মরশুম হচ্ছে আড়াই মাস, টেনেটুনে তিন মাস। কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ; খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ থাকে ; মানেক মেহতা মরশুমের শেষে এসে কখনও নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যেত, কখনও বা টাকা ব্যাঙ্কেই জমা থাকত।

সোরাব হোমজি প্রতি বছরই গরমের সময় মহাবলেশ্বরে আসতেন এবং সহ্যাদ্রি হোটেলে উঠতেন। হোটেলটি তাঁর খুব পছন্দ। মনে মনে ইচ্ছে ছিল এই রকম একটি হোটেল পেলে নিজে চালাবেন। তিনি পয়সাওয়ালা লোক, জীবিকার জন্য কাজ করবার দরকার নেই। কিন্তু ব্যবসা করার প্রবৃত্তি পার্সীদের মজ্জাগত।

গত বছর মে মাসে হোমজি যথারীতি এসেছেন। পুরনো খদ্দের হিসেবে হোটেলে তাঁর খুব খাতির, স্বয়ং হৈমবতী তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করতেন। হোমজিও হৈমবতীর নিপুণ গৃহস্থালীর জন্যে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একদিন হৈমবতী বিমর্ষভাবে হোমজিকে বললেন, 'শেঠজি, আসছে বছর আপনি যখন আসবেন তখন আমাদের আর দেখতে পাবেন না।'

হোমজি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি, দেখতে পাব না কেন?'

হৈমবতী বললেন, 'হোটেল বিক্রি করার কথা হচ্ছে। যিনি আমাদের পার্টনার তিনি হোটেল রাখবেন না। আমরাও চলে যাব। আমার স্বামীর এত ঠাণ্ডা সহ্য হচ্ছে না, আমরা দেশে ফিরে যাব।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোমজি অফিস-ঘরে গিয়ে বিজয় বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, 'আপনারা নাকি হোটেল বিক্রি করছেন?'

বিজয় বিশ্বাসের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়। একটু কাহিল গোছের চেহারা ; আপাদমস্তক গরম জামাকাপড় পরে, গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, হোমজিকে খাতির করে বসালেন। বললেন, 'হ্যাঁ শেঠজি! আপনি কিনবেন?'

হোমজি বললেন, 'ভাল দর পেলে কিনতে পারি। আপনার পার্টনার কোথায়?'

বিশ্বাস বললেন, 'আমার পার্টনার এখন বিদেশে আছেন, তাই আমাকে আমমোক্তারনামা দিয়েছেন। এই দেখুন।' তিনি দেরাজ থেকে পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নি বার করে দেখালেন।

তারপর দর-কষাকষি আরম্ভ হল ; বিজয় বিশ্বাস হাঁকলেন দেড় লাখ, হোমজি বললেন, পঞ্চাশ হাজার। শেষ পর্যন্ত চুরাশি হাজারে রফা হল। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি কেনা তো দু'চার দিনের কাজ নয় ; দলিল দস্তাবেজ তদারক করা, উকিল, অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করা, রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ খবর নেওয়া ; এইসব করতে কয়েক মাস কেটে গেল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হোমজি আর বিজয় বিশ্বাস পুণায় গেলেন ; রেজিস্ট্রারের সামনে হোমজি নগদ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি করালেন। কথা হল, পয়লা ডিসেম্বর তিনি হোটেলের দখল নেবেন। তারপর হোমজি বোম্বাই গেলেন, বিজয় বিশ্বাস মহাবলেশ্বরে ফিরে এলেন।

হোটেলে তখন অতিথি নেই, একটা চাকরানী ছাড়া চাকরবাকরও বিদেয় হয়েছে। তাই এরপর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তা কেবল হৈমবতীর জবানবন্দী থেকেই জানা যায়। মানেক মেহতা নিশ্চয় নিজে আড়ালে থাকবার মতলব করেই বিজয় বিশ্বাসকে মোক্তারনামা দিয়েছিল। যেদিন কবালা রেজিস্ট্রি হল, তার পরদিন রাত্রি ন'টার সময় সে সহ্যাদ্রি হোটেলে এসে হাজির। পরে পুলিসের তদন্তে জানা গিয়েছিল মানেক মেহতা মহাবলেশ্বরের বাইরে

দু'মাইল দূরে মোটর রেখে পায়ে হেঁটে মহাবলেশ্বরে ঢুকেছিল।

সে যখন পৌঁছল তখন বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস-ঘরে বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। চাকরানীটা শুতে গিয়েছিল। তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। মানেক মেহতার গায়ে মোটা ওভারকোট, মাথায় পশমের মঙ্কি-ক্যাপ। তার ব্যবহার বরাবরই খুব মিষ্টি। সে এসে বলল, 'হৈমাবেন, আমি আজ রাত্রে এখানেই থাকব, আর খাব। সামান্য কিছু হলেই চলবে।'

হৈমবতী খাবারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন, চাকরানীকে আর জাগালেন না। মানেক মেহতা আর বিজয় বিশ্বাস কাজকর্মের কথা শুরু করলেন। অফিস-ঘরে একটা মজবুত লোহার সিন্দুক ছিল, হোটেল বিক্রির টাকা এবং ব্যাঙ্কের জমা টাকা, সব এই সিন্দুকেই রাখা হয়েছিল। বিজয় বিশ্বাস জানতেন দু'এক দিনের মধ্যেই মেহতা টাকা নিতে আসবে।

হৈমবতী রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে ভাজাভুজি তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর কান পড়ে রইল অফিস-ঘরের দিকে। রান্নাঘর অফিস-ঘর থেকে বেশি দূর নয়, তার ওপর নিস্তব্ধ রাত্রি। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনতে পেলেন, ওঁরা দু'জন অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হোটেলের পিছন দিকের জমিতে চলে গেলেন। হৈমবতীর একটু আশ্চর্য লাগল ; কারণ তাঁর স্বামী শীত-কাতুরে মানুষ, এত শীতে খোলা হাওয়ায় যাওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু হৈমবতীর মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না, তিনি রান্নাঘর থেকে বেরুলেন না, যেমন রান্না করছিলেন করতে লাগলেন।

তারপর হোটেলের পিছন দিক থেকে একটা চাপা চীৎকারের শব্দ শুনে তিনি একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। তাঁর স্বামীর গলার চীৎকার। ক্ষণকাল স্তম্ভিত অবস্থায় থেকে তিনি ছুটে গেলেন হোটেলের পিছন দিকে। পিছনের জমিতে যাবার একটা দরজা আছে, হৈমবতী দরজার কাছে পৌঁচেছেন, এমন সময় মানেক মেহতা ওদিক থেকে ঝড়ের মত এসে ঢুকল। হৈমবতীকে সজোরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সদরের দিকে চলে গেল।

'কি হল ! কি হল !' বলে হৈমবতী পিছনের জমিতে ছুটে গেলেন। সেখানে কেউ নেই। হৈমবতী তখন স্বামীর খোঁজে অফিস-ঘরের দিকে ছুটলেন। সেখানে দেখলেন লোহার সিন্দুকের কবাট খোলা রয়েছে, তার ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিল সব অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় দেড় লাখ টাকার নোট।

এতক্ষণে হৈমবতী প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন ; মানেক মেহতা তাঁর স্বামীকে ঠেলে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আর সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়েছে ! তিনি চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। —

ভাই অজিত, আজ এইখানেই থামতে হল। ঘরের মধ্যে অশরীরীর উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। কাল বাকি চিঠি শেষ করব।

৪ঠা জানুআরি। কাল চিঠি শেষ করতে পারিনি, আজ রাত্রি দশটার পর মোমবাতি জ্বালিয়ে আবার আরম্ভ করেছি। হোমজি খেতে বসে গল্প বলছিলেন। গল্প শেষ হবার আগেই খাওয়া শেষ হল, আমরা বসবার ঘরে উঠে গেলাম। চাকর কফি দিয়ে গেল।

হোমজি আবার বলতে শুরু করলেন। আমি আজ আরও সংক্ষেপে তার পুনরাবৃত্তি করছি। —

হৈমবতীর যখন জ্ঞান হল তখন দশটা বেজে গেছে, ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার। হৈমবতী চাকরানীকে জাগালেন, কিন্তু সে রাত্রে বাইরে থেকে কোনও সাহায্যই

পাওয়া গেল না। পুলিস এল পরদিন সকালে।

পুলিসের অনুসন্ধানে বোঝা গেল হৈমবতীর অনুমান ঠিক। হোটেলের পিছনে খাদের ধারে মানুষের ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। দু'চার দিন অনুসন্ধান চালাবার পর আরও অনেক খবর বেরুল। মানেক মেহতা ডুব মেরেছে। সে পাকিস্তান থেকে তিন লক্ষ টাকার সোনা আমদানি করেছিল, কাস্টম্‌সের কাছে ধরা পড়ে যায়। মানেক মেহতা ধরা না পড়লেও একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই অংশীদারকে খুন করে সে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতিয়েছে।

এদিকে খাদের তলা থেকে বিজয় বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু এমন দুর্গম এই খাদ যে, সেখানে পৌঁছুনো অতি কষ্টকর ব্যাপার। উপরন্তু সম্প্রতি একজোড়া বাঘ এসে খাদের মধ্যে আড্ডা গেড়েছে। গভীর রাত্রে তাদের হাঁকার শোনা যায়। যাহোক, কয়েকজন পাহাড়ীকে নিয়ে তিনদিন পরে পুলিস খাদে নেমে দেখল বিজয় বিশ্বাসের দেহের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই ; কয়েকটা হাড়গোড় আর রক্তমাখা কাপড়জামা, গলাবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে তারা ফিরে এল। পুলিসের মনে আর কোনও সংশয় রইল না, মানেক মেহতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া জারি করল।

ক্রমে ১লা ডিসেম্বর এসে পড়ল। নিঃস্ব বিধবার অবস্থা বুঝতেই পারছো। হোমজি দয়ালু লোক, হৈমবতীকে কিছু টাকা দিলেন। হৈমবতী চোখের জল মুছতে মুছতে মহাবলেশ্বর থেকে চিরবিদায় নিলেন।

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে। পুলিস এখনও মানেক মেহতার সন্ধান পায়নি। বাঘ আর বাঘিনী কিন্তু এখনও খাদের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের রক্তের স্বাদ তারা পেয়েছে, এ স্থান ছেড়ে যেতে পারছে না।

হোমজির গল্প শুনে মনটা একটু খারাপ হল। বাঙালীর সন্তান সুদূর বিদেশে এসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা কপালে সইল না। হৈমবতীর অবস্থা আরও শোচনীয়। মানেক মেহতাকে পুলিস ধরতে পারবে কিনা কে জানে ; ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্র থেকে একটি পুঁটিমাছকে ধরা সহজ নয়।

এই সব ভাবছি এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। বললাম, 'এ কি !'

হোমজি বললেন, 'দশটা বেজেছে। এখানে রাত্রি দশটার সময় ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে যায়, আবার শেষ রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে জ্বলে !—চলুন, আপনাকে আপনার শোবার ঘরে পৌঁছে দিই।'

হোমজির একটা লম্বা গদার মত ইলেকট্রিক টর্চ আছে, সেটা হাতে নিয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দোতলায় এক সারি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে, কেবল কোণের ঘরের দরজা খোলা। চাকর ঘরে মোমবাতি জ্বেলে রেখে গেছে। (ভাল কথা, এদেশে মোমবাতিকে মেমবাতি বলে ; ভারি কবিত্বপূর্ণ নাম, নয় ?)

বেশ বড় ঘর ; সামনে বারান্দা, পাশে ব্যাল্‌কনি। ঘরের দু'পাশে দু'টো খাট রয়েছে ; একটাতে বিছানা পাতা, অন্যটা উলঙ্গ পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর দু'টো চেয়ার, দেয়ালের গায়ে ঠেকানো ওয়ার্ডরোব। টেবিলের উপর একটি অ্যালার্ম টাইমপীস্‌। এক বাণ্ডিল মোমবাতি, দেশলাই, একটা থার্মোফ্লাস্কে গরম কফি ; রাত্রে যদি তেষ্টা পায়, খাব। হোমজি অতিথি সৎকারের ত্রুটি রাখেননি।

হোমজি বললেন, 'এই ঘরে বিজয় বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। হৈমবতী চলে যাবার পর ঘরটা যেমন ছিল তেমনি আছে। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো ?'

বললাম, 'অসুবিধে কিসের। খুব আরামে থাকব। আপনি যান, এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এখানে বোধ হয় সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়াই রেওয়াজ।'

হোমজি হেসে বললেন, 'শীতকালে তাই বটে। কিন্তু সকাল আটটা ন'টার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না। আপনি যদি আগে উঠতে চান, ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন। এই টর্চটা রাখুন, রাত্রে যদি দরকার হয়।'

'ধন্যবাদ।'

হোমজি নেমে গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। মোমবাতির আলোয় ঘরটা অবছায়া দেখাচ্ছে। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে ঘরময় একবার ঘুরে বেড়ালাম। আমার সুটকেস চাকর ওয়ার্ডরোবের পাশে রেখে গেছে। ওয়ার্ডরোব খুলে দেখলাম সেটা খালি। এসেন্স-কর্পূর-ন্যাপথলিন মেশা একটা গন্ধ নাকে এল। হৈমবতী এই ওয়ার্ডরোবেই নিজের কাপড়-চোপড় রাখতেন। ঘরের পিছন দিকে একটা সরু দরজা রয়েছে, খুলে দেখলাম গোসলখানা। আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর চেয়ারে এসে বসে সিগারেট ধরালাম।

ঘরের দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু যেন একটা বরফজমানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে-বেড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ বসে থাকা চলবে না ; তাড়াতাড়ি সিগারেট শেষ করে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলাম, সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙলেই যথেষ্ট। আপ্টে আসবেন ন'টার সময়।

টর্চটা বালিশের পাশে নিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে বিছানায় ঢুকলাম। বিছানায় দু'টো মোটা মোটা গদি, গোটা চারেক বিলিতি কম্বল ; একেবারে রাজশয্যা। ক্রমশ কম্বলের মধ্যে শরীর গরম হতে লাগল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য এই যে, প্রথম রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত কোনও ইশারা-ইঙ্গিত পাইনি।

ঘুম ভাঙল ঝন্‌ঝন্ অ্যালার্মের শব্দে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার ; কোথায় আছি মনে করতে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর মনে পড়ল। কিন্তু—এত শীগ্‌গির সাড়ে সাতটা বেজে গেল ! কৈ জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে না তো !

টর্চ জ্বেলে ঘড়ির উপর আলো ফেললাম। চোখে ঘুমের জড়তা রয়েছে, মনে হল ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। কিন্তু অ্যালার্ম ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে চলেছে।

কি রকম হল ! আমি কম্বল ছেড়ে উঠলাম, টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ির উপর আলো ফেলে দেখলাম—সত্যি দু'টো। তবে অ্যালার্ম বাজল কি করে ? অ্যালার্মের কাঁটা ঘোরাতে কি ভুল করেছি ?

ঘড়িটা হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। দেখলাম অ্যালার্মের কাঁটা ঠিকই সাড়ে সাতটার উপর আছে।

হয়তো ঘড়িটাতে গলদ আছে, অসময়ে অ্যালার্ম বাজে। আমি ঘড়ি রেখে আবার বিছানায় ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ঘুম এল না। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

এই হল প্রথম রাত্রির ঘটনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার টাইমপীসে কি অসময়ে অ্যালার্ম বাজে ?'

তিনি ভুরু তুলে বলেন, 'কৈ না ! কেন বলুন তো ?'

বললাম। তিনি শুনে উদ্বিগ্ন মুখে একটু চুপ করে রইলেন ; তারপর বললেন, 'হয়তো সম্প্রতি খারাপ হয়েছে। আমার অন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি আছে, সেটা আজ রাত্রে আপনাকে

দেব।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাকর একটি চিঠি এনে আমার হাতে দিল।

আপ্টের চিঠি। তিনি লিখেছেন, কাল রাত্রে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে তাঁর পায়ের গোছ মচ্‌কে গেছে, নড়ার ক্ষমতা নেই; আমরা যদি দয়া করে আসি।

চিঠি হোমজিকে দেখালাম। তিনি মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বললেন, 'চলুন, দেখে আসি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কতদূর?'

'মাইল দুই হবে। বাজারের মধ্যে। এখানে মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ আছে, আপ্টের আত্মীয় তার ম্যানেজার। ব্যাঙ্কের উপরতলায় থাকেন।'

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরুলাম। হোমজির একটি ছোটখাটো স্ট্যান্ডার্ড মোটর আছে, তাইতে চড়ে গেলাম; ব্যাঙ্কের বাড়িটা দোতলা, বাড়ির পাশ থেকে খোলা সিঁড়ি ওপরে উঠেছে। আমরা ওপরে উঠে গেলাম।

আপ্টে বালিশের ওপর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা তুলে দিয়ে খাটে শুয়ে আছেন, আমাদের দেখে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখুন দেখি! কোথায় আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, তা নয় একেবারে শয্যাশায়ী।'

আমরা খাটের পাশে চেয়ারে বসলাম, 'কি হয়েছিল?'

আপ্টে বললেন, 'রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনলাম, দরজায় কে খুট্‌খুট্ করে টোকা মারছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম, কিন্তু দোর খুলে দেখি কেউ নেই। আবার দোর বন্ধ করে ফিরছি, পা মুচড়ে পড়ে গেলাম। বাঁ পা-টা স্প্রেন্ হয়ে গেল।'

'আর কোথাও লাগেনি তো?'

'না, আর কোথাও লাগেনি। কিন্তু—' আপ্টে একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য! আমি হোঁচট খাইনি, পায়ে কাপড়ও জড়িয়ে যায়নি। ঠিক মনে হল কেউ আমাকে পিছন থেকে ঠেলে দিলে।'

আমার কি মনে হল, জিগ্যেস করলাম, 'রাত্রি তখন ক'টা?'

'ঠিক দু'টো।'

এ বিষয়ে আর কথা হল না, গৃহস্বামী এসে পড়লেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেও অনন্তরাও দেশপাণ্ডে বেশ ফুর্তিবাজ লোক। আজকাল ব্যাঙ্কের কাজকর্ম নেই বললেই হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমালেন। আপ্টের পা ভাঙা নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা-তামাশা হল, গরম গরম চিঁড়েভাজা আর পোট্যাটো-চিপ্‌স্ দিয়ে আর এক প্রস্থ কফি হল। তারপর আমরা উঠলাম। আপ্টে কাতরভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম মিস্টার বক্সীকে মহাবলেশ্বর ঘুরিয়ে দেখাব, তা আর হল না। দু'তিন দিন মাটিতে পা রাখতেই পারব না।'

হোমজি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, আমি ওঁকে মহাবলেশ্বর দেখিয়ে দেব। আমার তো এখন ছুটি।'

কাল আবার আসব বলে আমরা চলে এলাম। দুপুরবেলা লাঞ্চ খেয়ে হোমজির সঙ্গে বেরুলাম। কাছাকাছি কয়েকটা দর্শনীয় স্থান আছে। একটি হ্রদ আছে, তাতে মোটর-লঞ্চ চড়ে বেড়ালাম। মহাবলেশ্বরের মধু বিখ্যাত, কয়েকটি মধুর কারখানা দেখলাম; মৌমাছি মধু তৈরি করছে আর মানুষ তাই বিক্রি করে পয়সা রোজগার করছে। মৌমাছিদের খেতে দিতে হয় না, মজুরি দিতে হয় না, একটি ফুলের বাগান থাকলেই হল।

কিন্তু যাক, বাজে কথা লিখে চিঠি বড় করব না। এখনও আসল কথা সবই বাকি। হোমজির কাছ থেকে একটা চিঠির প্যাড যোগাড় করেছি, তা প্রায় ফুরিয়ে এল।

সে রাত্রে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে শুতে গেলাম। চাকর সব ঠিকঠাক করে রেখে গিয়েছে। দেখলাম পুরনো ঘড়ির বদলে একটা নতুন অ্যালার্ম ঘড়ি রেখে গেছে। আমি এতে আর দম দিলাম না, অ্যালার্মের চাবিটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। অ্যালার্মের দরকার নেই, যখন ঘুম ভাঙবে তখন উঠব।

আলো নেভার আগেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শুয়ে শুয়ে দেখছি একটা চামচিকে ঘরে ঢুকেছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ, তাই পালাতে পারেছ না, নিঃশব্দ পাখায় ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। দরজা খুলে তাকে তাড়ানো যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল। আর উপায় নেই। জন্তুটা সারারাত্রি পালাবার রাস্তা খুঁজে উড়ে বেড়াবে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকবে।—

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, ঘুম আসছে না। কাল রাত্রি দু'টোর সময় আমার ঘরে অকারণে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল, আর ঠিক সেই সময় দু'মাইল দূরে আপ্টের পা মচকালো, দু'টো ঘটনার মধ্যে নৈসর্গিক সম্পর্ক কিছুই নেই। সমাপতন ছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ, আপ্টের পা যদি না মচকাতো, তিনি আজ এই ঘরে অন্য খাটে শুতেন।—চামচিকেটা কি এখনও উড়ে বেড়াচ্ছে? আমার গায়ে এসে পড়বে না তো! পড়ে পড়ুক। ইতর প্রাণীকে আমার ভয় নেই। সত্যবতী আরশোলা আর ইঁদুরকে ভয় করে...খোকা ভয় করে টিক্‌টিকিকে...

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কানের কাছে কড় কড় শব্দে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। কম্বলের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। নতুন ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে। এর আওয়াজ আরও উগ্র। কিন্তু অ্যালার্ম বাজার তো কথা নয়, আমি দম দিইনি, চাবি বন্ধ করে দিয়েছি। তবে?

টর্চ জ্বেলে বিছানা থেকে উঠলাম। ঘড়িতে দু'টো বেজেছে। (অ্যালার্মের চাবি যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ, তবু বাজনা বেজে চলেছে।)

ঘড়ি হাতে তুলে নিতেই বাজনা থেমে গেল। যেমন ঘড়ি তেমনি ঘড়ি, অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক।

অজিত, তুমি জানো, আমি রহস্য ভালবাসি না; রহস্য দেখলেই আমার মন তাকে ভেঙে চুরে তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আবিষ্কার করতে লেগে যায়। কিন্তু এ কী রকম রহস্য? অলৌকিক ঘটনার প্রতি আমার বুদ্ধি স্বভাবতই বিমুখ, যা প্রমাণ কথা যায় না তা বিশ্বাস করতে আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু এ কী? চক্ষু কর্ণ দিয়ে যাকে প্রত্যক্ষ করছি তার সঙ্গে ঐহিক কিছুরই কোনও সংস্রব নেই। অমূলক কারণহীন ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে।

এর মূল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। মোমবাতি জ্বাললাম। তোমাকে আগে লিখেছি ঘরে দু'টো চেয়ার আছে। তার মধ্যে একটা সাধারণ খাড়া চেয়ার, অন্যটা দোলনা চেয়ার। আমি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে দোলনা চেয়ারে বসলাম, সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগলাম।

দোরের দিকে মুখ করে বসেছি। ডান পাশে টেবিল, বাঁ পাশে দেয়ালে লাগানো ওয়ার্ডরোব, পিছনে আমার খাট। আমি সিগারেট টানতে টানতে দুলছি আর ভাবছি। চামচিকেটা কোথায় ছিল জানি না, বাতি জ্বলতে দেখে আবার উড়তে আরম্ভ করেছে; আমার মাথা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। পাখার শব্দ নেই, কেবল এক টুক্‌রো জমাট অন্ধকার শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে আছি, ভাবছি কী হতে পারে? দু'টো ঘড়িতেই বেতালা

অ্যালার্ম বাজে ? তবে কি হোমজি আমার সঙ্গে practical joke করছেন। আমি কাল ভূতের কথায় হেসেছিলাম, তাই তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তা যদি হয় তাহলে ঘড়িটার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করলেই ধরা যাবে। কিন্তু হোমজি বয়স্থ ব্যক্তি, এমন বাঁদুরে রসিকতা করবেন ?

কতক্ষণ চোখ বুজে বসে দোল খাচ্ছিলাম বলতে পারি না, মিনিট পনরোর বেশি নয় ; চোখ খুলে চমকে গেলাম। দোলনা চেয়ারটা দুলতে দুলতে ঘুরে গেছে ; আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, এখন ওয়ার্ডরোবের দিকে মুখ করে বসে আছি। শুধু তাই নয়, ওয়ার্ডরোবের খুব খাছে এসে পড়েছি।

চেয়ার ঘুরে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু রাত দু'টোর সময় একলা ঘরে এরকম ব্যাপার ঘটলে স্নায়ুগুলে ধাক্কা লাগে। আমারও লেগেছিল। তার ওপর ঘড়িটা আবার পিছন দিক্ থেকে ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। আমি লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা বন্ধ করতে গেলাম, মোমবাতি নিভে গেল।

বোঝ ব্যাপার ! আমার স্নায়ু যদি দুর্বল হত, তাহলে কি করতাম বলা যায় না। কিন্তু আমি দেহটাকে শক্ত করে স্নায়ুর উৎকণ্ঠা দমন করলাম। আমার গায়ের কম্বলের বাতাস লেগে হয়তো মোমবাতি নিভেছে। আমি আবার মোমবাতি জ্বাললাম। ঘড়িটা হাতে নিতেই তার বাজনা থেমে গেল।

কিন্তু ঘড়িকে আর বিশ্বাস নেই। আমি সেটাকে হাতে নিয়ে ওয়ার্ডরোবের কাছে গেলাম। ওয়ার্ডরোবে আমার কাপড়-চোপড় রেখেছি, তার মধ্যে ঘড়ি চাপা দিয়ে রাখব। তারপর ঘড়ি যত বাজে বাজুক।

ওয়ার্ডরোবের কপাটি খুলতেই সেন্ট-কর্পূর-ন্যাপথলিন মেশা গন্ধটা নাকে এল। আমি ঘড়িটাকে আমার জামা-কাপড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে কপাটি বন্ধ করে দিলাম।

আড়াইটে বেজেছে, এখনও অর্ধেক রাত বাকি। আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মস্তিষ্ক গরম হয়েছে ; তন্দ্রা আসছে, আবার ছুটে যাচ্ছে। ঘড়িটা ওআর্ডরোবের মধ্যে বাজছে কিনা শুনতে পাচ্ছি না। তারপর ক্রমে বোধ হয় ঘুম এসে গিয়েছিল।—

বিকট চীৎকার করে জেগে উঠলাম। কম্বলের মধ্যে আমার পেটের কাছে একটা কিছু কিল্‌বিল করছে। টিকটিকি কিংবা ব্যাঙ কিংবা চামচিকে। একটানে কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলাম ; টর্চ জ্বাললাম, মোমবাতি জ্বাললাম। বিছানায় কোনও জন্তু-জানোয়ার নেই। চামচিকেটাও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। হাতঘড়িতে দেখলাম রাত্রি সাড়ে তিনটে।

বাকি রাত্রিটা টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। আর ঘুমোবার চেষ্টা বৃথা।

চিঠি ভীষণ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভৌতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার চটপট শেষ করব।

পাঁচটার সময় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো।

আমি ওয়ার্ডরোব খুলে ঘড়ি বার করলাম। ঘড়ির সঙ্গে একটা বাদামী কাগজের চিলতে বেরিয়ে এল। তাতে বাংলা হরফে একটা ঠিকানা লেখা আছে। কলকাতার দক্ষিণ সীমানার একটা ঠিকানা। ঠিকানাটা নকল করে পাঠালাম, তোমার দরকার হবে।

আমার স্কাউট-ছুরি দিয়ে ঘড়িটা খুললাম। যন্ত্রপাতির কোনও গণ্ডগোল নেই। সহজ

ঘড়ি।

আমি সত্যান্বেষী। সত্যকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য, তা সে লৌকিক সত্যই হোক, আর অলৌকিক সত্যই হোক। কায়াহীনকে সম্বোধন করে বললাম, 'তুমি কী চাও?'

উত্তর এল না, কেবল টেবিলটা নড়ে উঠল। আমি টেবিলের ওপর হাত রেখে বসেছিলাম।

বললাম, 'তুমি কি চাও আমি তোমার মৃত্যুর তদন্ত করি?'

এবার টেবিল তো নড়লই, আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম তার পিছনে পায়াদু'টো উঁচু হয়ে উঠল। আমি প্রায় টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

বললাম, 'বুঝেছি। কিন্তু পুলিস তো তদন্ত করছেই। আমি করলে কী সুবিধে হবে? আমি কোথায় তদন্ত করব?'

ঘড়িটা চড়াং করে একবার বেজেই থেমে গেল। ঠিকানা লেখা বাদামী কাগজের চিল্‌তেটা টেবিলের একপাশে রাখা ছিল, সেটা যেন হাওয়া লেগে আমার সামনে সরে এল।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। মানেক মেহতা কি বাংলাদেশে গিয়ে লুকিয়ে আছে-? আশ্চর্য নয়। একলা লুকিয়ে আছে? কিংবা—

বললাম, 'হুঁ, আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি নিভে গেল; দেখলাম জানালার শার্সি দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হোমজিকে কিছু বললাম না। ন'টার সময় দু'জনে আপ্টেকে দেখতে গেলাম। মোটরে যেতে যেতে হোমজিকে জিগ্যেস করলাম, 'হৈমবতীর চেহারা কেমন?'

হোমজি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'ভাল চেহারা। রঙ খুব ফরসা নয়, কিন্তু ভারি চটকদার চেহারা।'

'বয়স?'

'হয়তো ত্রিশের কিছু বেশি। কিন্তু দীর্ঘযৌবনা, শরীরের বাঁধুনি ঢিলে হয়নি।'—

আপ্টের পা কালকের চেয়ে ভাল, কিন্তু এখনও হাঁটতে পারেন না। গৃহস্বামী অনন্তরাও দেশপাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হল। তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম—

'আপনি বিজয় বিশ্বাসকে চিনতেন?'

'চিনতাম বৈকি। সহ্যাদ্রি হোটেলের সব টাকাই আমার ব্যাঙ্কে ছিল।'

'কত টাকা?'

'সীজনের শেষে প্রায় পঁতাল্লিশ হাজার দাঁড়িয়েছিল।'

'বিজয় বিশ্বাসের নিজের আলাদা কোনও অ্যাকাউণ্ট ছিল?'

'ছিল। আন্দাজ দু'হাজার টাকা। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি প্রায় সব টাকা বার করে নিয়েছিলেন। শ'খানেক টাকা পড়ে আছে।'

'তাঁর স্ত্রী যাবার আগে সে টাকা বার করে নেননি?'

'স্ত্রী যতক্ষণ কোর্ট থেকে ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তো তাঁকে টাকা দিতে পারি না।'

'হৈমবতী এখন কোথায়? তাঁর ঠিকানা জানেন?'

'না।'

'আর কেউ জানে?'

হোমজি বললেন, 'বোধ হয় না। যাবার সময় তিনি নিজেই জানতেন না কোথায়

যাবেন।'

আমি আপ্টেকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি নিশ্চয় এ মামলার খবর রাখেন। মানেক মেহতার কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে?'

তিনি বললেন, 'না। সন্ধান পাওয়া গেলে আমি জানতে পারতাম।'

'মানেক মেহতার ফটোগ্রাফ আছে?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ ছিল। সহ্যাদ্রি হোটেল যখন আরম্ভ হয় তখন মানেক মেহতা, বিজয় বিশ্বাস আর হৈমবতী একসঙ্গে ছবি তুলিয়েছিল। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি।'

হোটেলে ফিরে এসে দুপুরবেলা খুব ঘুমোলাম। রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু বার বার বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি। বিদেহাত্মা আমার এই চিঠি লেখাতে সন্তুষ্ট নয়, অথচ সে কী চায় বোঝাতে পারছে না। যাহোক, আজ চিঠি শেষ করব।

এতখানি ভণিতার কারণ বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের যে ঠিকানা দিলাম তুমি সেখানে যাবে। যদি সেখানে হৈমবতী বিশ্বাসের দেখা না পাও তাহলে কিছু করবার নেই। কিন্তু যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করবে: মানেক মেহতার সঙ্গে তাঁদের যে গ্রুপ-ফটো তোলা হয়েছিল সেটা কোথায়? মানেক মেহতার সঙ্গে হৈমবতীর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা জানবার চেষ্টা করবে। কবে কোথায় বিশ্বাসদের সঙ্গে মেহতার পরিচয় হয়েছিল? হৈমবতীর আর্থিক অবস্থা এখন কেমন? বাড়িতে কে কে আছে—সব খবর নেবে। যে প্রশ্নই তোমার মনে আসুক জিগ্যেস করবে। তারপর সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাকে লিখে জানাবে; কোনও কথা তুচ্ছ বলে বাদ দেবে না। যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানাবে।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব। এখানে এই দারুণ শীতে বেশিদিন থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেতেও পারছি না।

আশা করি খোকা ও সত্যবতী ভাল আছে এবং তুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা ঝেড়ে ফেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছ।

ভালবাসা নিও।

—তোমার ব্যোমকেশ

কলিকাতা
৮ই জানুআরি

ভাই ব্যোমকেশ,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেয়েছি এবং রাত্রে বসে জবাব লিখছি। হায় নাস্তিক, তুমি শেষে ভূতের খপ্পরে পড়ে গেলে! সত্যবতী জানতে চাইছে, ভূত বটে তো? পেত্নী নয়? ওদিকের পেত্নীরা নাকি ভারি জাঁহাবাজ হয়।

যাক, বাজে কথা লিখে পুঁথি বাড়াব না। তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেলা তিনটে নাগাদ বাসা থেকে বেরুচ্ছি, বিকাশ দত্ত এল। আমি কোথায় যাচ্ছি শুনে সে বলল, 'আরে সর্বনাশ, সে যে ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। পথ চিনে যেতে পারবেন?'

বললাম, 'তুমি চল না।' বিকাশ রাজী হল। তাকে সব বললাম না, মোটামুটি একটা আন্দাজ দিলাম।

দু'জনে চললাম। সত্যি ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর। ট্রামে বাসে কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেখানে কেবল একটি লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তায়

দু'তিন শো গজ অন্তর একটা বাড়ি। শেষ পর্যন্ত বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটের সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। রাস্তা থেকে খানিক পিছিয়ে ছোট একতলা বাড়ি ; চারিদিকে খোলা মাঠ। বিকাশকে বললাম, 'তুমি রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে বিড়ি খাও। আমি এখনি ফিরতে পারি, আবার ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।'

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, আমি গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটা চাকর এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। বলল, 'কাকে চান ?'

বললাম, 'শ্রীমতী হৈমবতী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনার নাম ?'

'অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'কী দরকার ?'

'সেটা শ্রীমতী বিশ্বাসকেই বলব। তুমি তাঁকে বোলো মহাবলেশ্বর থেকে চিঠি পেয়ে এসেছি।'

'আজ্ঞে। একটু দাঁড়ান।' বলে চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি ; সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা খুলল। চাকরটা বলল, 'আসুন।'

বাড়িতে ঢুকেই ঘর। আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই, দু'টো চেয়ার, একটা টেবিল। চাকর বলল, 'আজ্ঞে বসুন। গিন্নী ঠাকরুন চান করছেন, এখনি আসবেন।'

একটা চেয়ারে বসলাম। বসে আছি তো বসেই আছি। চাকরটা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছে, বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজকাল কলকাতার যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিতে ভয় হয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা যা-কিছু হতে পারে।

বসে বসে ভাবলাম, গিন্নী ঠাকরুনের স্নান যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চাকরটাকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করি। বললাম, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ?'

চাকরটা অন্দরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, এই তো একমাসও এখনও হয়নি।'

দেখলাম লোকটির কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

'তোমার দেশ কোথায় ?'

'ফরিদপুর জেলায়'—বলে সে চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসল। আধবয়সী লোক, মাথায় কদমছাঁট চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা রঙের সোয়েটার।

'কতদিন কলকাতায় আছ ?'

'তা তিন বছর হতে চলল।'

'এখানে—মানে এই বাড়িতে—ক'জন মানুষ থাকে ?'

'গিন্নী ঠাকরুন একলা থাকেন।'

'স্ত্রীলোক—একলা থাকেন। পুরুষ কেউ নেই ?'

'আজ্ঞে না। আমি বুড়োমানুষ, দেখাশুনা করি।'

'এখানে কারুর যাওয়া-আসা আছে ?'

'আজ্ঞে না, আপনিই পেরথম এলেন।'

এই সময় হৈমবতীকে দোরের কাছে দেখা গেল। চাকরটা উঠে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে দিনের আলো কমে গিয়েছিল, তিনি চাকরকে বললেন,

'মহেশ, আলো জ্বেলে নিয়ে এস।'

চাকর চলে গেল। অল্প আলোতেও মহিলাটিকে দেখার অসুবিধা ছিল না। দীঘল চেহারা, সুশ্রী মুখ, পার্সীদের চোখে খুব ফরসা না লাগলেও আমার চোখে বেশ ফরসা। মুখে একটি চিত্তাকর্ষক সৌকুমার্য আছে। যৌবনের চৌকাঠ পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পরনে সাদা থান, গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই। কবিত্ব করছি না, কিন্তু তাঁর সদ্যস্নাত চেহারাটি দেখে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার রজনীগন্ধার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম; তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'আপনি মহাবলেশ্বর থেকে আসছেন?'

আমি বললাম, 'না, আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী মহাবলেশ্বরে আছেন, তাঁর চিঠি পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'তবে কি মানেক মেহতা ধরা পড়েছে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল।

বললাম, 'না, এখনও ধরা পড়েনি।'

হৈমবতী আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন, নিরাশ স্বরে বললেন, 'বসুন। আমার কাছে এসেছেন কেন?'

আমি বসলাম, বললাম, 'আমার বন্ধু ব্যোমকেশ বক্সী—'

তিনি বললেন, 'ব্যোমকেশ বক্সী কে? পুলিসের লোক?'

'না। ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেননি'—এই বলে তোমার পরিচয় দিলাম। তাঁর মুখ নিরুৎসুক হয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকে যতটা বিখ্যাত মনে কর, ততটা বিখ্যাত নও। সব শুনে হৈমবতী বললেন, 'আমি জানতুম না। সারা জীবন বিদেশে কেটেছে—'

এই সময় মহেশ চাকর একটা লণ্ঠন এনে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। বলা বাহুল্য, বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই।

লণ্ঠনের আলোয় হৈমবতীর মুখ আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম। ব্যথিত আশাহত মুখ ক্লান্তিভরে থমথম করছে, দু'একগাছি ভিজে চুল কপালে গালে জুড়ে রয়েছে। আমার মন লজ্জিত হয়ে উঠল; এই শোক-নিষিক্তা মহিলাকে বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাড়াতাড়ি প্রশ্নগুলো শেষ করে চলে যাওয়াই কর্তব্য। বললাম, 'আমাকে মাফ করবেন। মানেক মেহতাকে ধরবার উদ্দেশ্যেই ব্যোমকেশ আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে।—মানেক মেহতার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় কবে হয়?'

হৈমবতী বললেন, 'ছয় বছর আগে। আমাদের তখন আমেদাবাদে ছোট্ট একটি হোটেল ছিল। কি কুক্ষণেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল!'

'মানেক মেহতার সঙ্গে আপনার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল?'

'আমার সঙ্গে তার সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছয় বারের বেশি দেখা হয়নি। বছরের মধ্যে একবার কি দু'বার আসত; চুপিচুপি আসত, নিজের ভাগের টাকা নিয়ে চুপিচুপি যেত।'

'তার এই চুপিচুপি আসা-যাওয়া দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের কোন সন্দেহ হয়নি?'

'না। আমরা ভাবতাম তার স্বভাবই ওই রকম, নিজেকে জাহির করতে চায় না।'

'তার কোনও ফটোগ্রাফ আছে কি?'

'একটা গ্রুপ-ফটো ছিল, সহ্যাদ্রি হোটেলের অফিসে টাঙানো থাকত। সে রাত্রে আমি মূর্ছা ভেঙে দেখলুম দেয়ালে ছবিটা নেই।'

'সে রাত্রে হোটেলের লোহার সিন্দুকে কত টাকা ছিল?'

'ঠিক জানি না। আন্দাজ দেড় লাখ!'

অতঃপর আর কি প্রশ্ন করব ভেবে পেলাম না। আমি উঠি-উঠি করছি, হৈমবতী আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি এখানে আছি আপনার বন্ধু জানলেন কি করে? আমি তো কাউকে জানাইনি।'

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। মহিলাটির বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূতপ্রেতের অবতারণা না করাই ভাল। বললাম, 'তা জানি না, ব্যোমকেশ কিছু লেখেনি। আপনি উপস্থিত এখানেই আছেন তো?'

হৈমবতী বললেন, 'বোধ হয় আছি। আমার স্বামীর এক বন্ধু তাঁর এই বাড়িতে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।—আসুন, নমস্কার।'

বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় বিড়ির মুখে আগুন জ্বলছে, তাই দেখে বিকাশের কাছে গেলাম। তারপর দু'জনে ফিরে চললাম। ভাগ্যক্রমে খানিক দূর যাবার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বিকাশ বলল, 'কাজ হল?'

এই কথা আমিও ভাবছিলাম। হৈমবতীর দেখা পেয়েছি বটে, তাঁকে প্রশ্নও করেছি; কিন্তু কাজ হল কি? মানেক মেহতা এখন কোথায় তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গেল কি? বললাম, 'কতকটা হল।'

বিকাশ খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন ব্যোমকেশবাবুকে চিঠি লিখবেন, তখন তাঁকে জানাবেন যে, শোবার ঘরে দু'টো খাট আছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি জানলে কি করে?'

বিকাশ বলল, 'আপনি যখন মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি তখন বাড়ির সব জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি।'

'তাই নাকি! আর কি দেখলে?'

'যা কিছু দেখলাম, শোবার ঘরেই দেখলাম। অন্য ঘরে কিছু নেই।'

'কী দেখলে?'

'একটা মাঝারি গোছের লোহার সিন্দুক আছে। আমি যখন কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারলাম, তখন চাকরটা সিন্দুকের হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল।'

'চাকরটা! ঠিক দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে যখন সদর দরজা খুলেছিল তখন আমি তাকে দেখেছিলাম। সে ছাড়া বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই।'—

তারপর লেকের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। বিকাশ নিজের রাস্তা ধরল, আমি বাসায় ফিরে এলাম। রাত্রে বসে চিঠি লিখছি, কাল সকালে ডাকে দেব।

তুমি কেমন আছ? সত্যবতী আর খোকা ভাল আছে। আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তোমার অজিত

* * *

আমি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীর শেষাংশ লিখিতেছি। ব্যোমকেশের নামে সহ্যাদ্রি হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছিলাম ৯ তারিখের সকালে। ১২ তারিখের বিকালবেলা অনুমান তিনটার সময় ব্যোমকেশ আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে বলিলাম, 'একি! আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'চিঠি পেয়েই এলাম। প্লেনে এসেছি।—তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও, এখুনি বেরুতে

হবে।'—বলিয়া ব্যোমকেশ ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় বাড়ির সামনে পুলিসের ভ্যান দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে একজন ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল। আমরাও ভ্যানে উঠিয়া বসিলাম।

কয়েকদিন আগে যে সময় হৈমবতীর নির্জন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম, প্রায় সেই সময় আবার গিয়া পৌঁছিলাম। আজ কিন্তু ভৃত্য মহেশ দরজা খুলিয়া দিতে আসিল না। দরজা খোলাই ছিল। আমরা সদলবলে প্রবেশ করিলাম।

বাড়িতে কেহ নাই; হৈমবতী নাই, মহেশ নাই। কেবল আসবাবগুলি পড়িয়া আছে; বাহিরের ঘরে চেয়ার-টেবিল, শয়নকক্ষে দু'টি খাট ও লোহার সিন্দুক, রান্নাঘরে হাঁড়ি কলসী। লোহার সিন্দুকের কপাট খোলা, তাহার অভ্যন্তর শূন্য। ব্যোমকেশ করুণ হাসিয়া ইন্সপেক্টরের পানে চাহিল,—'চিড়িয়া উড়েছে।'—

সে রাত্রে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া ব্যোমকেশ ও আমি তক্তপোশের উপর গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়া ব্যোমকেশের গা ঘেঁষিয়া বসিল। একটা শীতের হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জোর ক্রমেই বাড়িতেছে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ছুঁচের মত বাতাস প্রবেশ করিয়া গায়ে বিঁধিতেছে।

বলিলাম, 'মহাবলেশ্বরের শীত তুমি খানিকটা সঙ্গে এনেছ দেখছি। আশা করি বিজয় বিশ্বাসের প্রেতটিকেও সঙ্গে আনোনি।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের কাছে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আমার পানে একটি সকৌতুক দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'প্রেত সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা এখনও যায়নি।'

বলিলাম, 'প্রেত সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা থাকা বিচিত্র নয়, কারণ প্রেতের সঙ্গে আমি কখনও রাত্রিবাস করিনি। আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যিই তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বিশ্বাস করা-না-করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?'

'ব্যোমকেশ বক্সীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কারণ তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভূত তো চোখে দেখিনি, বিশ্বাস করি কি করে?'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু আমি যদি বিশ্বাস করি, তুমি আপত্তি করবে কেন?'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলাম।

'আচ্ছা, ওকথা যাক। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। কিন্তু তোমার ভূতের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কার্যসিদ্ধি হল না।'

'কে বলে কার্যসিদ্ধি হয়নি? ভূত চেয়েছিল মস্ত একটা ধোঁকার টাটি ভেঙে দিতে। তা সে দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'মানে কি এখনও কিছুই বোঝোনি?'

'কেন বুঝব না? প্রথমে অবশ্য আমি হৈমবতীর চরিত্র ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি হৈমবতী আর মানেক মেহতা মিলে বিজয় বিশ্বাসকে খুন করেছিল। হৈমবতী একটি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।'

'হৈমবতীর চরিত্র ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু ভূতকে এখনও চেনোনি। ভূতের রহস্য আরও

সাংঘাতিক।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের আরও কাছে সরিয়া গেল, হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমার শীত করছে।'

'শীত করছে, না ভয় করছে।' ব্যোমকেশ হাসিয়া নিজের আলোয়ানের অর্ধেকটা তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল।

বলিলাম, 'এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো। বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমাকে আবার লজ্জা কি! তুমি তো অবোধ শিশু।'

সত্যবতী সায় দিয়া বলিল, 'নয়তো কি! যার বিয়ে হয়নি সে তো দুধের ছেলে।'

বলিলাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, এখন ভূতের কথা হোক। আমি কিছুই বুঝিনি, তুমি সব খোলসা করে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে তোমাকে দু' একটা প্রশ্ন করি। মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় বিশ্বাস বা গেল কেন?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'জানি না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিজয় বিশ্বাসের নামে ব্যাঙ্কে হাজার দুই টাকা ছিল। হোটেল বিক্রি হবার আগেই সে টাকা বার করে নিয়েছিল কেন?'

'জানি না।'

'তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি যখন হৈমবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, তখন শীতের সন্ধ্যে হয়-হয়। চাকর যখন বলল হৈমবতী স্নান করছেন, তখন তোমার খট্‌কা লাগল না?'

'না। মানে—খেয়াল করিনি।'

'চতুর্থ প্রশ্ন। চাকরটাকে সন্দেহ হয়নি?'

'না। চাকরটাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ হয়নি। সে পূর্ববঙ্গের লোক, মাত্র কয়েকদিন হৈমবতীর চাকরিতে ঢুকেছিল। অবশ্য একথা যদি সত্যিই হয় যে সে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল—'

'অজিত, তোমার সরলতা সত্যিই মর্মস্পর্শী। চাকরটা সিন্দুক খোলবার উদ্যোগ করেছিল বটে, কিন্তু চুরি করবার জন্যে নয়।—মহাবলেশ্বরে দু'জন লোক খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তার মধ্যে একজন হচ্ছে হৈমবতী। অন্য লোকটি কে?'

'মানেক মেহতা ছাড়া আর কে হতে পারে?'

ব্যোমকেশ কুটিল হাসিয়া বলিল, 'ঐখানেই ধাপ্পা—প্রচণ্ড ধাপ্পা। হৈমবতী ষড়যন্ত্র করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে, মানেক মেহতার সঙ্গে নয়। হৈমবতীর আর যে দোষই থাক, সে পতিব্রতা নারী, তাতে সন্দেহ নেই।'

হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, 'কী বলছ তুমি!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো।—হোমজি যখন আমাকে গল্পটা বললেন তখন আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। তবু একটা খট্‌কা লেগেছিল : মানেক মেহতা বিজয় বিশ্বাসকে খুন করবার জন্যে খাদের ধারে নিয়ে গেল কেন? বিজয় শীত-কাতুরে লোক ছিল, সে-ই বা গেল কেন?

'তারপর ভূতের উৎপাত শুরু হল। দায়ে পড়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম। খট্‌কা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হতে লাগল। তারপর ওয়ার্ডরোবের মধ্যে পেলাম একটুকরো বাদামী কাগজে একটা ঠিকানা ; বাংলা অক্ষরে লেখা কলকাতার উপকণ্ঠের একটা ঠিকানা। আমার মনের অন্ধকার একটু একটু করে দূর হতে লাগল।

'তোমাকে লম্বা চিঠি লিখলাম। তারপর তোমার উত্তর যখন পেলাম তখন আর কোনও সংশয় রইল না। আপ্টে সাহেবকে সব কথা বললাম। তিনি তখনও ঠ্যাং নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তখনই কলকাতার পুলিসকে টেলিগ্রাম করলেন এবং আমার প্লেনে আসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাসকে ধরা গেল না বটে, কিন্তু প্রেতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আসল অপরাধী কারা তা জানা গেছে। বলা বাহুল্য, যে প্রেতটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে ধরেছিল সে মানেক মেহতা।'

সত্যবতী বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল বল না গো!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যি কি হয়েছিল তা জানে কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস। আমি মোটামুটি যা আন্দাজ করেছি, তাই তোমাদের বলছি।'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল।—'মানেক মেহতা ছিল নামকাটা বদমাশ, আর বিজয় বিশ্বাস ছিল ভিজে বেড়াল। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে। দু'জনে মিলে হোটেল খুলল। মেহতার টাকা, বিশ্বাসদের মেহনত।

'স্ত্রী-পুরুষে হোটেল চালাচ্ছে, হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল। প্রতি বছর ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। মেহতা মাঝে মাঝে এসে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে যায়। বিজয় বিশ্বাস নিজের ভাগের টাকা মহাবলেশ্বরের ব্যাঙ্কে বেশি রাখে না, বোধ হয় স্ত্রীর নামে অন্য কোথাও রাখে। হয়তো কলকাতারই কোনও ব্যাঙ্কে হৈমবতীর নামে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা জমা আছে, ওরা দু'জনে ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না।

'এইভাবে বেশ চলছিল, গত বছর মানেক মেহতা বিপদে পড়ে গেল। তার বে-আইনী সোনার চালান ধরা পড়ে গেল। তাকে পুলিস জড়াতে পারল না বটে, কিন্তু অত সোনা মারা যাওয়ায় সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তখন তার একমাত্র মূলধন—হোটেল; মানেক মেহতা ঠিক করল সে হোটেল বিক্রি করবে। তার নগদ টাকা চাই।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হোটেল বিক্রির টাকা কে পাবে। একলা মেহতা পাবে, না, বিজয় বিশ্বাসেরও বখরা আছে? ওদের পার্টনারশিপের দলিল আমি দেখিনি। অনুমান করা যেতে পারে যে মানেক মেহতা যখন হোটেল কেনার টাকা দিয়েছিল, তখন হোটেল বিক্রির টাকাটাও পুরোপুরি তারই প্রাপ্য। আমার বিশ্বাস, মেহতা সব টাকাই দাবি করেছিল।

'হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস ঠিক করল সব টাকা ওরাই নেবে। ওদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা যায় না, কিন্তু ওদের প্রকৃতি যে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ তাতে আর সন্দেহ নেই। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল। মানেক মেহতা পুলিসের নজরলাগা দাগী লোক, তার ঘাড়ে অপরাধের ভার চাপিয়ে দেওয়া সহজ। স্বামী-স্ত্রী মিলে নিপুণভাবে প্ল্যান গড়ে তুলল।

'কলকাতার উপকণ্ঠে তখন কি ভাবে ওরা বাসা ঠিক করেছিল, আমি জানি না। হয়তো কলকাতার কোনও পরিচিত লোকের মারফত বাসা ঠিক করেছিল। হৈমবতী বাসার ঠিকানা কাগজে লিখে ওয়ার্ডরোবের মধ্যে গুঁজে রেখেছিল, পাছে ঠিকানা ভুলে যায়। পরে অবশ্য ঠিকানা তাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই হৈমবতী যাবার সময় বাদামী কাগজের টুকরোটা ওয়ার্ডরোবেই ফেলে যায়। কাঠের ওয়ার্ডরোবে বাদামী কাগজের টুকরোটা বোধহয় চোখে পড়েনি। ঐ একটি মারাত্মক ভুল হৈমবতী করেছিল।

'যাহোক, নির্দিষ্ট রাত্রে মানেক মেহতা চুপিচুপি এসে হাজির। হোটেলে একটিও অতিথি নেই। চাকরানীটাকে হৈমবতী নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। হোটেলে ছিল কেবল হৈমবতী আর বিজয় বিশ্বাস।

'মানেক মেহ্‌তাকে ওরা হোটেলের অফিস-ঘরেই খুন করেছিল। এমনভাবে খুন করেছিল যাতে রক্তপাত না হয়। তারপর ছদ্মবেশ ধারণের পালা। বিজয় বিশ্বাস মানেক মেহ্‌তার গা থেকে জামা কাপড় খুলে নিজে পরল, নিজের জামা কাপড় গলাবন্ধ মানেক মেহ্‌তাকে পরিয়ে দিল। তারপর দু'জনে লাশ নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল। কিছুদিন থেকে এক ব্যাঘ্র-দম্পতি এসে খাদে বাসা নিয়েছিল, সুতরাং লাশের যে কিছুই থাকবে না তা বিশ্বাস-দম্পতি জানত। ব্যাঘ্র-দম্পতির কথা বিবেচনা করেই তারা প্ল্যান করেছিল।

'আসল কাজ শেষ হলে বিজয় বিশ্বাস সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নিষুতি শীতের রাত্রি, কেউ তাকে দেখল না। মানেক মেহ্‌তা শহরের বাইরে রাস্তার ধারে মোটর রেখে এসেছিল, সেই মোটরে চড়ে বিজয় বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল।

'হৈমবতী ঘাঁটি আগলে রইল। বুকের পাটা আছে ওই মেয়েমানুষটির। তারপর যা যা ঘটেছিল সবই প্রকাশ্য ব্যাপার। একমাত্র সাক্ষী হৈমবতী, সে যা বলল পুলিস তাই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করার কোনও ছিল না, মানেক মেহ্‌তার চরিত্র পুলিস জানত।

'কয়েকদিন পরে সহ্যাদ্রি হোটেল হোমজির হাতে তুলে দিয়ে শোকসন্তপ্তা বিধবা হৈমবতী মহাবলেশ্বর থেকে চলে গেল। ইতিমধ্যে বিজয় বিশ্বাস কলকাতার বাসায় এসে আড্ডা গেড়েছিল, হৈমবতীও এসে জুটল।

'কিন্তু তারা ভারি হুঁশিয়ার লোক, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়নি, সাবধানে ছিল ; তাই মহাবলেশ্বরের চিঠি পেয়ে অজিত যখন দেখা করতে গেল তখন হৈমবতী চমকে উঠল বটে কিন্তু ঘাবড়ালো না। হৈমবতীর তখন বোধ হয় বিধবার সাজ ছিল না, সে বিধবা সাজতে গেল। চাকর অজিতকে বাইরের ঘরে বসাল। অজিত যদি এত সরল না হত, তাহলে ওর খট্‌কা লাগত ; শীতের সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা গা ধুতে পারে, চুল ভিজিয়ে স্নান করে না।

'যাহোক, হৈমবতী যখন এল তখন তার সদ্যস্নাত চেহারা দেখে অজিত মুগ্ধ হয়ে গেল। সে হৈমবতীকে আমার নাম বলল ; হৈমবতীর ব্যাপার বুঝতে তিলার্ধ দেরি হল না। অজিত আমার নামটাকে যতখানি অখ্যাত মনে করে, ততখানি অখ্যাত নয় আমার নাম, অজিতের কল্যাণেই নামটা সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যাক। বিকাশ ওদিকে জানালা দিয়ে শোবার ঘরে দু'টো খাট আর লোহার সিন্দুক দেখে নিয়েছিল। অজিতের চিঠিতে ওটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী কথা। চিঠি পড়ে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না।

'কিন্তু ওদের ধরা গেল না। সে রাত্রে অজিত পিছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় হৈমবতী লোহার সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। এখন তারা কোথায়, কোন্ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে। হয়তো তারা কোনও দিনই ধরা পড়বে না, হয়তো ধরা পড়বে। না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ—'

কিছুক্ষণ তিনজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরে যে হাওয়া উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে দশটা বাজিল।

আমি বলিলাম, 'সব সমস্যার তো সমাধান হল, কিন্তু একটা কথা বুঝলুম না। বিজয় বিশ্বাস ও বাড়িতে থাকতো না কেন ? কোথায় থাকত ? চাকরটা ওদের সম্বন্ধে কি কিছুই সন্দেহ করেনি ?'

ব্যোমকেশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হা ভগবান, তাও বোঝোনি ? চাকরটাই বিজয় বিশ্বাস।'